بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে। এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে গৃহ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়, সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত রচনা করে, ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি বেশ কয়েকবার অন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্ম দ্বারা এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কথা তো খুবই ভালো, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে, যখন সুযোগ হয় তখন কতজন এমন আছে যারা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি স্বয়ং তা মেনেও চলেন। মানুষ তখনই আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারবে যখন আমাদের কথা এবং কর্ম এক ও অভিন্ন হবে। মানুষ শুধু কথা শোনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তারা আমাদেরকে দেখেও থাকে বা আমাদের ওপর তাদের দৃষ্টিও থাকে। আমি জার্মানী সফরকালে শেষ যে জুমুআ পড়িয়েছি তাতে সম্ভবত বলেছি যে, মসজিদের উদ্বোধনের সময় জার্মানীতে সেই অঞ্চলের জেলা কমিশনার এই আপত্তি করে যে, তোমরা মহিলাদের সাথে মুসাফাহ্ বা করমর্দন না করে তাদের সাথে মন্দ আচরণ করছ। আমি যখন এর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করি তখন এক ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা কালে এটিও বলে যে, আপনি সঠিক বলেছেন, স্বাধীনতা সবারই রয়েছে, তাদের ধর্ম বা তাদের সামাজিক ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি যা বলে তা মেনে চলার অধিকার তাদের আছে, যেখানে সেটি মেনে চললে সেই দেশ এবং জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় না। সেই ব্যক্তি বলে, তোমাদের খলীফা এটা ঠিক কথাই বলেছেন, তবে এর বাস্তব চিত্র সামনে তখনই আসবে যখন আমরা দেখব যে, আহমদী যুবকরাও এটি মেনে চলে কিনা বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এটি মানছে কিনা। অতএব ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা কোন শিক্ষা বা নির্দেশ বা এই প্রেক্ষাপটে উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথা বলি তখন অ-আহমদীরা বা অ-মুসলিমরা আমাদেরকে অভিনিবেশী দৃষ্টিতে দেখেও থাকে যে, তাদের নিজেদের আমল কেমন। কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, মহানবী (সা.) মু'মিনের উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য যে শিক্ষা

দিয়েছেন তাহলো, তোমাদের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিচয় তখন পাওয়া যাবে যখন তোমাদের চারিত্রিক গুণাবলীও উন্নত মানের হবে এবং তোমাদের একের জন্য অপরের আবেগ অনুভূতির মানও উন্নত হবে। আর সেই মান কি? সেই মান হলো নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অন্যদের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। এটি হওয়া উচিত নয় যে, নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচার-ন্যায়বিচার' ধ্বনী উচ্চকিত করতে থাকবে আর অন্যদের অধিকার প্রদানের বেলায় নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে।

অতএব নিজেদের অধিকার হস্তগত করার জন্য আমরা যেভাবে ব্যকুল হয়ে পড়ি অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের একই মানদন্ডে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আমরা যেমন চাই যে, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ধরপাকড় করা না হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে অন্য কেউ কোন ভুল করলে যার ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে এবং যদি একই ভুল বা অন্যায় বারবার না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই একই ব্যবহার অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল বা ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থহানি ঘটে তাহলে এটি তখন ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি থাকে না বরং ব্যক্তিগত সেই অপরাধ সামাজিক অপরাধে পর্যবসিত হয়, আর তখন এমন অপরাধীদের বিচারিক সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে।

যাহোক আমি এ কথা বলছি যে, সমাজে পারস্পরিক দৈনন্দিন বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে মনে করি যে এটি আমার অধিকার, এখন প্রশ্ন হলো আমরা অন্যদেরও সেই অধিকার প্রদান করি কিনা বা অন্যদের সেই অধিকার প্রদানের মনমানসিকতা আমরা রাখি কিনা। আর এই ক্ষেত্রে মৌলিক একক হলো গৃহ, বন্ধু-মহল, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। যখন ক্ষুদ্র পরিসরে বা নিজের ক্ষুদ্র গন্ডিতে এই চিন্তা চেতনা বিরাজমান থাকবে তখন সমাজের বৃহত্তর গন্ডিতেও এই একই চিন্তা চেতনার বিস্তার ঘটবে। স্বার্থপরতার অবসান হবে, অন্যের অধিকা প্রদানকারীর সংখ্যাও হবে বেশি, ক্ষমা করার প্রবণতা বাড়বে এবং শাস্তি দেয়া বা শাস্তি পাওয়ানোর প্রতি মনোযোগ কম নিবদ্ধ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও বাহ্যিক অধিকার প্রদান এবং চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমা করার মনমানসিকতা অর্জনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

অর্থাৎ যারা স্বাচ্ছন্দেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দেও খরচ করে, আর ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে, আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সেসব বান্দার অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য খরচ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা অভাবী। মোহসেন বা সৎকর্মশীল তারাই যারা অন্যদের প্রয়োজনে কাজে আসে, অন্যের হিত সাধন করে, পুণ্যের বা নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী। সুতরাং যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদার সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যারা অন্যের কল্যাণ সাধন করে, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যেও খরচ করে। আর মানুষের মাঝে যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এমন মানুষ আর স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না, নিজ ভাইয়ের অমঙ্গল বা ক্ষতি চায় না। আর এমন মানুষ তখন আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করে এবং সেসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মোহসেন বা সৎকর্মশীলদের আরেকটি লক্ষণ হলো তারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর এমনভাবে নিজেদের সংবরণ করে বা এমন পরিস্থিতিতেও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আর এর প্রমাণ তখন পাওয়া যায় যখন রাগ সংবরণ করার পর অন্যদের ক্ষমা করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এটি কোন সামান্য বিষয় নয় যে, সকল প্রকার রাগ বা ক্রোধ এবং প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি অনেক বড় বিষয় যে, রাগও হবে না আর প্রতিশোধ প্রবণতাও মন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর শুধু এটিই নয় যে, প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে উৎপাটন করা হবে বরং যে ভুল করে তার ওপর কিছুটা এহসানও যেন করা হয়, এটি অনেক বড় একটি বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চান মু'মিনদের ভিতর যেন এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে হযরত হাসান (রা.)-এর একটি ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবার তার এক কৃতদাস কোন ভুল করে যার ফলে উনার অত্যধিক রাগ হয় আর তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। তখন সেই কৃতদাস আয়াতের এই অংশ পড়েন যে, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ অর্থাৎ পুণ্যবানরা তো ক্রোধ সংবরণ করে। এটি শুনে হযরত হাসান শাস্তি দেয়ার জন্য যে হাত উঠিয়েছিলেন তা নিচে নামিয়ে নেন এবং হাত উঠাননি। এতে সেই কৃতদাস আরো সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে, وَالْعَافِينَ অর্থাৎ এমন পুণ্যবানরা মানুষকে ক্ষমা বা মার্জনাও করে। তখন হযরত হাসান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী বলেন, যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এটি শুনে সেই দাস আরো সাহসী হয়ে উঠলো এবং বললো, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এহসানকারীদের বা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন। তখন তিনি সেই কৃতদাসকে বলেন যে, যাও তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

অতএব ঐশী প্রেম লাভের আকাঙ্খী যারা এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীতি অবলম্বন করে চলে, তাদের জীবনাচার হলো, তারা শুধু দোষী ব্যক্তির দোষ ক্ষমাই করে না বরং তারা তাদের ওপর এহসান বা অনুগ্রহও করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এক জায়গায় বলেন,

স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোর ব্যবহার করে এবং ক্ষেপে যায় তার মুখ বা জিহ্বা থেকে আদৌ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কথা নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে নিজ প্রতিদ্বন্দীর সামনে দ্রুত ক্ষেপে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি নোংরা এবং নিয়ন্ত্রণহীন কথা বলে তার বিবেক বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। যারা গালি

দেয়, যারা লাগামহীন কথাবার্তা বলে, হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায় যা সুগভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং খোদার পছন্দনীয় কথা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। যে ক্রোধের সামনে পরাস্ত হয় তার বিবেক বুদ্ধি মোটা এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে এবং কোন ময়দান বা ক্ষেত্রে তাকে কখনও বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ বা রাগ উন্মাদনার অর্ধেক। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, স্মরণ রেখ বিবেক-বুদ্ধি এবং রাগ ও ক্রোধের মাঝে এক বৈরীতা বিদ্যমান। বুদ্ধিমান মানুষ অযথা উত্তেজিত হয় না যা ক্রোধের কারণ হয়। তিনি বলেন যখন রাগ হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি সঠিক অবস্থানে থাকতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক আলো বা জ্যোতি প্রদান করা হয় যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিতে এক নব আলো সৃষ্টি হয়ে যায় আর এরপর সেই আলো থেকে আরো আলোর স্ফুরন হয়। রাগ বা ক্রোধের অবস্থায় মন-মস্তিষ্ক যেহেতু তমসাচ্ছন্ন থাকে তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই বিস্তার ঘটে বা অমানিশা থেকে অমানিশাই ছেয়ে যায়।

সুতরাং ইসলামী শিক্ষা গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বা গভীর হিকমতে সজ্জিত, সিদ্ধান্ত করার সময় মানুষ যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের বিরোধী হয় তখনও মানুষের চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। অনেক সময় কঠোরতাও প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইসলামে শাস্তির দৃষ্টিভঙ্গী বা শাস্তি দেয়ার শিক্ষাও রয়েছে। কিন্তু এর জন্য কিছু নিয়ম এবং নীতি নির্ধারিত আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেয়া মানুষকে হিকমত বা প্রজ্ঞা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং ন্যায় বিচার থেকে দূরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, তাই ক্রোধের বশবর্তী যদি হয়ে শাস্তি দাও তাহলে এটি হৃদয়ের কঠোরতা বলেই সাব্যস্ত হবে। আর হৃদয় যদি কঠোর হয়ে যায় তখন তত্ত্বজ্ঞান এবং হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা মুখ থেকে আর নিঃসৃত হয় না বরং মানুষের কান্ডজ্ঞান তখন লোপ পায়। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাগ এবং ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ কর, মাথা ঠান্ডা কর, এরপর শাস্তি দেয়া বা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নাও। কিন্তু এতেও শর্ত হলো এর ভার তোমার হাতে যদি ন্যস্ত থাকে। এমন নয় যে, সবাই শাস্তি দেয়ার অধিকার পেয়ে গেছে। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। তাই ধৈর্য্যের মান উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, ধৈর্য্যশীলদের চিন্তা-শক্তি এবং বিবেককে আলোকিত করা হয়, তাদের চিন্তাধারা পরিপক্ক হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে পথের দিশা দেয়া হয়। যে কোন বিষয়ে মু'মিন বিবেকসম্মত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে, তা সেই সিদ্ধান্তটি তার নিজের কাছে অপছন্দনীয়ই হোক না কেন। তড়িঘড়ি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না বরং ধৈর্য্যের সাথে সবকিছু দেখে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবকিছু সামনে রেখে তবেই তারা সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া চাই, যেভাবে আমি বলেছি, শাস্তি দেয়ার অধিকারও সবার নেই বা সবাই শাস্তি দিতে পারে না। যে কেউ বা যে কোন ব্যক্তি এটি বলতে পারে না যে, আমি চিন্তা করেছি আর আমার বিবেক-বুদ্ধি বলে যে, শাস্তি দেয়া উচিত তাই আমি শাস্তি দিচ্ছি। বর্তমান যুগে শাস্তি প্রদান করা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজ। মানুষ নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাকে ক্ষমা করতে পারে বা ক্ষমা করার অধিকার সে রাখে কিন্তু শাস্তি প্রদানের জন্য অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে হয় বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাধীনে নিতে হয়। মানুষ এই কথা যদি সবসময় নিজের দৃষ্টিগোচরে রাখে তাহলে পারস্পরিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ হয় তা হওয়ার কথা নয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলাবাজি করে নিজেদের যে সময় এবং অর্থ নষ্ট হচ্ছে তা নষ্ট হতো না। আদালতে মামলা যাওয়ার পর যদি আদালত কোন এক পক্ষের অপরাধ ক্ষমা করে তাহলে অপর পক্ষের ক্রোধ এবং রাগ আরো বেড়ে যায় যে, ক্ষমা করা হলো কেন বা লঘু শাস্তি কেন দেয়া হলো আর সে তখন সেই মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে নিয়ে যায়, অথচ বিষয় এমনও নয় যা ভয়াবহ হতে পারে, সামান্য বিষয় নিয়ে তারা এমনটি করে থাকে। আমাদের বিচার বিভাগেও এমন বিষয়াদি এসে থাকে। কোন কোন আহমদী বলে, জামাতের বিচার বিভাগ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিব না আর তারা আদালতে চলে যায়। অথচ তেমন বড় কোন বিষয় নয় যার জন্য মামলাবাজির আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। আর এ কারণে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রাগ এবং ক্রোধ সংবরণের পর ক্ষমা করার যে শিক্ষা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাশূন্যভাবে তিনি বলে দেননি যে, ক্ষমা করতে থাক, বরং ক্ষমা এবং শাস্তির হিকমত উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (সূরা আশ্-শূরা: ৪১)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি যতটা অন্যায় করা হয় সে অনুপাতে হয়ে থাকে। অতএব যে কেউ ক্ষমা করে আর এর উদ্দেশ্য সংশোধন হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্‌র হাতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

অতএব, মূল বিষয় হলো অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে সংশোধন করা, এটি নয় যে, প্রতিশোধ নেয়া বা মামলায় জড়ানো অথবা নিজের সম্পদের ক্ষতি করা বা অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করা কিংবা নিজের ও অন্যেরও সময় নষ্ট করা এবং জামাতী প্রতিষ্ঠানের হাতে যদি বিষয় থাকে তাহলে জামাতের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করা। আসল উদ্দেশ্য, ক্ষমা করার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করা উচিত। আর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়া যদি আবশ্যক হয় তাহলে প্রজ্ঞার দাবি হলো শাস্তি প্রদান করা। আর এরপর, নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে লিখেছেন। এক জায়গায় যেমন: তিরিয়াকুল কুলূব পুস্তকে তিনি বলেন,

ন্যায় বিচারের বিধিমত অপরাধ অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধকে এই শর্তের আওতায় ক্ষমা করে যে, সেই ক্ষমার ফলে অপরাধীর সংশোধন হবে, এমন নয় যে, এর ফলে সে অপরাধের ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠবে, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট বড় পুরস্কার পাবে।

পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে তিনি (আ.) বলেন,

পাপের শাস্তি বিধানে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের দাবি হলো অপরাধী ততটাই শাস্তিযোগ্য যতটা অপরাধ সে করেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি মার্জনা বা ক্ষমা করার মাধ্যমে অপরাধীর সংশোধন করে অর্থাৎ এমন মার্জনা হওয়া উচিত নয় যার ফলাফল ন্যয়ের মানদন্ডে অপছন্দনীয় হতে পারে তাহলে এমন মার্জনাকারী আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে। অর্থাৎ ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে এটি অনেক ভালো কথা। আর এর ব্যাখ্যা হলো, এই ক্ষমার ফলে যেন কোন প্রকার ধৃষ্টতা সৃষ্টি না হয়। এই ক্ষমার ফলে যদি কোন অপছন্দনীয় বিষয় সামনে না আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরূপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার কাছে রয়েছে, তিনি যতটা চান তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন।

অতএব মার্জনা এবং ক্ষমা তখন করতে হয় যখন অপরাধী তার নিজ আচরণে স্বচ্ছ থাকে, অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এই অন্যায় কাজ সে আর করবে না। অনেকেই আছে অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে থাকে আর প্রত্যেকবার অপরাধ করার পর সে ক্ষমা চায়। এমন লোকদের জন্য শাস্তি আবশ্যক। আর সেই শাস্তিও এমন হওয়া উচিত যার ফলে সংশোধনের দিকটি সামনে আসে।

অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, পাপ বা অন্যায়ের শাস্তি ততটাই হওয়া উচিত অন্যায় যতটা করা হয়েছে, কিন্তু কেউ যদি মার্জনা বা ক্ষমা করে আর সেই ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন। অতএব কুরআন অনুসারে সব জায়গায় প্রতিশোধ নেয়াও প্রশংসনীয় কাজ নয় আবার সর্বত্র মার্জনা করাও প্রশংসনীয় নয় বরং স্থান-কাল ভেদে তা করা উচিত। দেখতে হবে যে, পরিস্থিতি কেমন, কিসে কল্যাণ নিহিত, শাস্তিতে না ক্ষমায়। আর শাস্তি বা মার্জনা স্থান-কাল ভেদে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত, অযৌক্তিক কিছু হওয়া উচিত নয়। এটিই কুরআনের শিক্ষার মূল অর্থ ও মর্ম। এমন নয় যে, কোন নীতিমালা বা আচরণবিধি সামনে না রেখেই শাস্তি দেয়া হবে বা অযথাই ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর জন্য শাস্তির কিছু সীমা-পরিসীমা যেন নির্ধারিত রাখা হয় আর সেই গন্ডির মধ্যে তা থাকা উচিত। আর এটাও দেখতে হবে যে, কল্যাণ বা উপকারিতা কোথায়।

অতএব, এই হলো ইসলামী শাস্তি এবং ক্ষমার হিকমত বা প্রজ্ঞা যে, সংশোধন মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আজকাল, যেসব জাগতিক আইন-কানুন রয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে, বিচারিক দন্ডবিধিতে সকল অপরাধেরই শাস্তি দেয়া হয় আর মানুষকে এজন্য কারাবন্দী করে রাখা হয় যেন সংশোধন হয়। কিন্তু এখন এসব উন্নত বিশ্বের বিশ্লেষকরাও লেখা আরম্ভ করেছে যে, অপরাধীরা

কারাগার থেকে শাস্তি ভোগ করে বাইরে আসার পর অপরাধের ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে যায় কেননা শাস্তি দাতারা এবং অপরাধীরাও শুধু আইনই মেনে চলে, খোদার ভয় তাদের মাঝে নেই। যাহোক মু'মিনদের জন্য সাধারণ শিক্ষা হলো তাদের মাঝে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করার অভ্যাস থাকা উচিত আর অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি এবং অপরাধীর আচরণ ও পরিস্থিতি অনুসারে তা ব্যবহার করা উচিত। চোখ বন্ধ করে সবাইকে ক্ষমা করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা চান না আবার রাগ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সবসময় শাস্তি দেয়ার মনমানসিকতা প্রকাশ করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। অবলীলায় ক্ষমা করতে থাকলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর চোখ বন্ধ করে শাস্তি দিতে থাকলেও হিংসা এবং বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সমাজে ঘৃণার এক প্রাচির গড়ে উঠতে থাকে এবং অশান্তির বিস্তার ঘটতে থাকে।

আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি প্রদান করি তাহলে দেখা যাবে, যাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় বা অপরাধ করা হয় তারা কঠোরভাবে এই দাবি উত্থাপন করে যে, অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে যেন অন্যদের জন্য এই শাস্তি শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে এবং আর কেউ যেন কোন প্রকার ভুল বা অপরাধ করার দুঃসাহস না দেখায়। আর অপরদিকে অপরাধী বা দোষী ব্যক্তি বলে যে, মার্জনা করা উচিত। বর্তমানে মানবাধিকারের নামে অনেক সংগঠন পৃথিবীতে দেখা যায়। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন কিছু ভালো কাজও করছে সেখানে ক্ষমা করানোর ক্ষেত্রেও তারা অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে আর সকল অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাতে চায়। অনুরূপভাবে যেসব অপরাধী ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা বোধ-বুদ্ধি বা সচেতনতা রাখে তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা কর। তাই ক্ষমা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নিজেও বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। তাই তোমরাও বান্দাদের অধিকার প্রদান করতঃ ক্ষমা কর। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পর্যায়েও সবাই যেন নিজের অপরাধীদের ক্ষমা করে আর জামাতীভাবেও যেন সবাইকে ক্ষমা করা হয়। এটি দেখার কোন প্রয়োজন নেই যে, এতে জামাতের ক্ষতি না উপকার হচ্ছে, শুধুমাত্র বান্দাদের অধিকার প্রদান যেন নিশ্চিত হয়। এইভাবে উভয় পক্ষ, যারা বড় বড় সব কথা বলে, হয় তারা অপরাধে অভ্যস্ত হয় নতুবা তারা ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিতে চায়। যারা অপরাধ করে আর অপরাধের শাস্তি এড়ানোর জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশের বরাতে অন্যায় কথা বলে এরা আসলে স্বার্থপর। এমন লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন অপরাধ বা অন্যায় করে তাহলে এরা কখনো ক্ষমা করে না বরং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে বৈধ-অবৈধ সকল চেষ্টাই করে থাকে। এখানে এসে তাদের নীতি বদলে যায়। তখন তারা খোদার এই নির্দেশকে ভুলে যায় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের বেলায়ও তা পছন্দ করা উচিত। অনুরূপভাবে যারা ক্ষমা করতে চায় না বরং এটি চায় যে, অপরাধীর অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত, তারাও নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হলে ক্ষমা চাইবে এবং বলবে, আসলে ক্ষমা করাই প্রশংসনীয়। ইসলাম এরূপ স্বার্থপরদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার ভিত্তিক

সিদ্ধান্ত দেয় যে, যদি নিশ্চিত হয় যে, ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তাহলে ক্ষমা করাই উত্তম। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে যদি বোঝা যায় যে, শাস্তি দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তি দেয়া উচিত। যাহোক এটি ইসলামের একটি নীতিগত শিক্ষা। এখন আমরা দৃষ্টি দেই যে, মহানবী (সা.) কতটা ক্ষমা করতেন আর সাহাবীদের এ সম্পর্কে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমি একটু পূর্বে হযরত ইমাম হাসানের দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে, তিনি তার এক ভৃত্যের দোষ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু সেটি ছিল সামান্য এক ত্রুটি। ক্ষমার পরম মার্গ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই যে, শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যাদের, তিনি (সা.) তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি অন্য কারো বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে কেবল তাকেই ক্ষমা করেননি বরং যারা তাঁর (সা.) নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, হত্যা করেছে তাঁর প্রিয় সন্তানদের, এদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কেননা তাদের সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। হাদীসে বর্ণিত এই ঘটনাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে রসূলে করীম (সা.)-এর কন্যা হযরত যায়নাব (রা.) এর ওপর এক ব্যক্তি হাব্বার বিন আসওয়াদ বর্শা দিয়ে আঘাত হেনে হামলা চালায়। তিনি তিনি (রা.) তখন গর্ভবতী ছিলেন আর এই আক্রমণের কারণে তার গর্ভপাত হয়ে যায়, তিনি আহত হন, আর এর ফলে তিনি ইন্তেকালও করেন। এই অপরাধের কারণে হাব্বারের জন্য হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে, মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার পর হাব্বার মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আমি করুণা ভিক্ষা চাইছি। আপনার ভয়ে আগে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার মার্জনা এবং দয়া আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা অজ্ঞ এবং মুশরিক ছিলাম। খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন স্বীকার করছি। অতএব আমার অজ্ঞতাকে আপনি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন আর আমায় ক্ষমা করে দিন। তাই মহানবী (সা.) তার কন্যার এই হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন আর বলেন যে, হে হাব্বার! যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার এহসান তথা অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। অতএব, তিনি (সা.) যখন দেখেছেন সংশোধন হয়ে গেছে তখন তিনি নিজের কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর বিরুদ্ধে কৃত কোন অপরাধের কখনই প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যেমন ইহুদী যে মহিলা তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন যদিও কোন কোন সাহাবীর ওপর সেই বিষের মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। এছাড়া ওহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কান, নাক ইত্যাদি কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল এমনকি কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য মহিলাদের সাথে মিশে গিয়ে সে-ও বয়আত গ্রহণ করে নেয়। তার কিছু প্রশ্নের কারণে মহানবী (সা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন

যে, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা? সে বলে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আন্তরিক হয়েই আমি এখন ইসলাম গ্রহণ করেছি। পূর্বে যা ঘটে গেছে তা মার্জনা করুন। মহানবী (সা.) তখন হিন্দাকে ক্ষমা করেন। হিন্দার ওপর তাঁর (সা.) মার্জনার এমন সুগভীর প্রভাব পড়ে যে, তার জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তার হৃদয়ে বসত গড়ে। এমনকি সেদিন সন্ধ্যায়ই মহানবী (সা.)-কে সে দাওয়াত করে এবং দু'টি ছাগল ভুনা করে খাবার জন্য পাঠিয়ে দেয় এবং একই সাথে এটিও বলে যে, আজকাল পশুর অভাব রয়েছে তাই এই সামান্য উপহার উপস্থাপন করছি। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হিন্দার পশুপালে অনেক বরকত দাও। সুতরাং, বলা হয় এই দোয়ার ফলে এত বরকত সৃষ্টি হয়েছে যে, তার পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না।

মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের ঘটনা সবারই জানা। তিনি (সা.) তার সমস্ত ধৃষ্টতা আর অবমাননা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেন, আর শুধু তাই নয় বরং তার জানাযাও পড়িয়েছেন তিনি (সা.)। হযরত উমর (রা.) যদিও বারবার বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তার জানাযা পড়াবেন না। কাব বিন যুহায়ের একজন সুপরিচিত কবি ছিল। কতিপয় কারণে তার ওপরও শাস্তি আরোপ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর তার ভাই তাকে লিখে পাঠায় যে, এখন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতএব সে মদিনা এসে তার পরিচিত এক ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নেয় আর মহানবী (সা.)-এর ইমামতিতে ফজরের নামায পড়ে। নামাযের পর রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কাব বিন যুহায়ের তওবার জন্য এসেছে এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। তিনি (সা.) তাকে চেহারায় চিনতেন না। তাই সে বলে, যদি অনুমতি হয় তাহলে তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাকে সামনে নিয়ে আসা হোক। সে তখন বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমিই কাব বিন যুহায়ের। তার সম্পর্কে যেহেতু পূর্বেই হত্যার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল সেই কারণে একজন আনসারী তখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, এ ব্যক্তি ক্ষমার আবেদন নিয়ে এসেছে, তাই তাকে ক্ষমা কর। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে সেই ব্যক্তি একটি কাসীদা বা কবিতা পরিবেশন করে। মহানবী (সা.) এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজ চাদর তাকে পরিয়ে দেন। অতএব এই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমার মান। তিনি (সা.) শুধু ক্ষমাই করতেন না বরং পুরস্কৃত করে, দোয়ার সাথে বিদায় দিতেন। মহানবী (সা.)-এর মার্জনার এমনই অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে, আর তাঁর ক্ষমা এত সুমহান পর্যায়ে উন্নীত যে, তা দেখে মানুষ হতবাক হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের ঘৃণ্য গালি দেয়া হয়েছে অনেক আর মারাত্মক কষ্টও দেয়া হয়েছে, তবুও তাদের জন্য নির্দেশ ছিল أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল] (সূরা আল্-আ'রাফ: ২০০)। সেই সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সেই মানব, স্বয়ং আমাদের নবী (সা.)-কে বড় ঘৃণ্যভাবে কষ্ট দেয়া

হয়েছে, এবং গালি-গালাজ করা হয়েছে নোংরা ভাষায় আর চরম ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে তাঁর প্রতি, কিন্তু মূর্তিমান নৈতিক চরিত্রের সেই ধারক ও বাহক, এর মোকাবিলায় কী করেছেন। তাদের জন্য আশিস কামনা করে দোয়া করেছেন। আর যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল যে, এসব অজ্ঞদেরকে যদি উপেক্ষা কর বা এড়িয়ে চল তাহলে তোমার সম্মান এবং প্রাণকে আমরা নিরাপদ রাখব, আর এই বাজারী বা জগতপূজারীরা কোনভাবেই তা কলূষিত করতে পারবে না। অতএব এমনই হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর বিরোধীরা তাঁর সম্মানকে কলূষিত করতে পারেনি আর নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে।

মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে ক্ষমা এবং মার্জনার কিরূপ মান অর্জনের জন্য নসীহত করেছেন সে সম্পর্কে হাদীসে অনেক ঘটনা দেখা যায়। এখানে দু'একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এক কৃতদাস রয়েছে যে অন্যায় কাজ করে, আমি কি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারি? রসূলে করীম (সা.) বলেন, তুমি তাকে প্রতিদিন ৭০বার ক্ষমা কর, অর্থাৎ অগণিত বার তাকে ক্ষমা কর। অতএব এই হলো দাস এবং অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহারের উন্নত মান যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আজকাল দাস-প্রথা নেই আর এক মু'মিন চাকরিজীবির কাছেও এটি প্রত্যাশা করা হয় যে, সেও তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা পালন করবে। যেহেতু ক্ষমার নির্দেশ রয়েছে তাই প্রতিটি কাজেই ভুল করতে থাকব, এটি অন্যায় আচরণ। যেমন অন্যান্য স্থানে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, যার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তার সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা উচিত। সুতরাং উভয় পক্ষের জন্যই সিদ্ধান্ত রয়েছে। মালিকের জন্য যেখানে নির্দেশ ছোট ছোট বিষয়ে রাগ করবে না এবং মার্জনা করবে সেখানে অধীনস্ত বা চাকরিজীবি যারা তাদের জন্যও নির্দেশ হলো তোমাদের নিজেদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলবে। ক্ষমা এবং মার্জনা সম্পর্কে আমাদেরকে উপদেশ দান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

জামাত প্রস্তুত করা বা গঠন করা বা সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য হলো মুখ, চোখ, কান, নাক এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তাকওয়া যেন অন্তর্দেশে প্রবেশ করে। তার ভিতরে এবং বাহিরে যেন তাকওয়ার আলো দেখা যায়। উন্নত চরিত্রের মহান দৃষ্টান্ত যেন সে হয়। অনর্থক রাগ এবং ক্রোধ যেন আদৌ না থাকে। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, জামাতের বেশিরভাগ সদস্যদের মাঝে এখনো রেগে যাওয়ার ব্যাধি রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দেয় এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। এমন লোকদের জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। তিনি বলেন, আমার মতে কি অসুবিধা এতে যে, কেউ গালি দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ থাকবে আর কোন উত্তর দিবে না? প্রত্যেক জামাতের সংশোধন প্রথমে নৈতিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতএব

প্রথমত ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে তরবিয়তের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর এর সবচেয়ে উন্নত রীতি হলো, কেউ দুর্ব্যবহার করলে তার জন্য বেদনাঘন হৃদয়ে দোয়া করা উচিত। ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে প্রথমে নিজের তরবিয়ত কর, এরপর অন্যেরও তরবিয়ত কর। আর এর জন্য উপায় হলো তার জন্য দোয়া কর, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার সংশোধন করেন। আর হৃদয়ে কোন প্রকার হিংসা এবং বিদ্বেষ পোষণ করে থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা কিছুতেই এটি পছন্দ করেন না যে, নমনীয়তা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা আর মার্জনার মত উন্নত গুণাবলীর স্থানে পাশবিকতা জায়গা নিবে। উন্নত গুণাবলী ধারণ এবং অবলম্বনের ক্ষেত্রে যদি উন্নতি কর তাহলে খুব স্বল্পতম সময়ে তোমরা আল্লাহ্-কে পেয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, সব মানুষের প্রকৃতি এবং ধাত একই রকম হয় না। মানুষের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এ কারণেই কুরআনে এসেছে যে, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৫)। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের গঠন এবং স্বভাব আর প্রকৃতি বা অভ্যাস অনুসারে আচার ব্যবহার করে। কিন্তু কোন গুণাবলির ক্ষেত্রে কেউ উন্নত হলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সে দুর্বল হতে পারে। একটি গুণ ভালো হলে দ্বিতীয়টি অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু এর আবশ্যকীয় অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তার সংশোধন হতেই পারে না বা কোন দোষ-ত্রুটি সংশোধন হওয়া সম্ভবই নয়। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করেছেন। কারো কোন গুণাবলী খুবই উন্নত এবং মহান কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে তার ভিতর কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তার সংশোধনই সম্ভব নয় অতএব উন্নত সব গুণাবলী অবলম্বন করা তার উচিত নয়। মানুষের প্রকৃতি এবং অভ্যাস নিঃসন্দেহে ভিন্ন-ভিন্ন, যাদের মাঝে দুর্বলতা দেখা যায় তাদের মাঝে কিছু ভালো গুণও রয়েছে। এটি নয় যে, কোন ব্যক্তির মাঝে আপাদমস্তক শুধু দোষই বিদ্যমান, আর কোন গুণই নেই। সবারই ভালো গুণও রয়েছে আর দুর্বলতাও রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটি চান যে, খোদার নির্দেশের অনুসরণে আমাদের উচিত নিজেদের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেয়া। আর সেসব উন্নত নৈতিক গুণাবলী ধারণ ও অবলম্বন করা উচিত যা এক প্রকৃত মু'মিনের মানদন্ড হয়ে থাকে। সবসময় দুর্বলতা দূরীভূত করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর সেইসাথে এই চেষ্টাও করা উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারি। আর এর জন্য মহানবী (সা.) যে নীতি বলেছেন তা হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ কর নিজ ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এসব মানদন্ডে উপনীত হতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।